International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 01-25
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.192

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য: ত্রিপুরা রাজতন্ত্রে, দরবারী সাহিত্যধারায় উজ্জ্বল নক্ষত্র

ড. বর্ণালী ভৌমিক ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপিকা এবং বাংলা বিভাগীয় প্রধান, বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত

Received: 12.03.2026; Accepted: 14.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article examines the literary contributions of Maharaja Bir Chandra Manikya within the framework of Tripura's courtly literary tradition, highlighting his dual identity as both ruler and poet. Situating his works within the broader historical and cultural context of the Manikya dynasty, the study underscores how Bengali emerged as the primary medium of court literature in Tripura, influenced by neighboring Bengal. Bir Chandra's poetic oeuvre – particularly Jhulan, Hori, Prem Marichika, Uchchhas, Akalkusum, and Sohag – reflects a rich confluence of Vaishnava devotional philosophy, lyrical expression, and royal aesthetic sensibility.

The analysis reveals that his early compositions, especially Jhulan and Hori, are deeply rooted in Vaishnava bhakti traditions, centering on Radha-Krishna devotion, divine love, and spiritual liberation. These works demonstrate refined musicality, ornate diction, and vivid imagery characteristic of courtly literature. Simultaneously, his later poetic works express intense personal grief and romantic introspection, particularly shaped by the loss of his first queen, thereby aligning his poetry with the emotive depth of Bengali lyrical traditions.

The article further explores the synthesis of personal emotion and royal consciousness in his writings, where themes of love, loss, devotion, and aesthetic beauty intersect. It argues that Bir Chandra Manikya's literary output not only enriched Tripura's cultural heritage but also contributed significantly to the evolution of Bengali court literature. Ultimately, his works stand as enduring documents of both individual sensibility and the socio-cultural ethos of Tripura's राजदरबार, embodying a unique blend of spirituality, artistry, and royal patronage.

Keywords: Bir Chandra Manikya, Courtly Literature, Vaishnavism, Bengali Poetry, Tripura Cultural History

ত্রিপুরায় স্বাধীন সুসংবদ্ধ রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন মাণিক্যবংশীয় রাজারা;ইতিহাস বলে, সম্ভবত মহামাণিক্য-ই প্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন, 'রাজমালা'-য় প্রাপ্ত তাম্রলিপির সূত্রানুযায়ী, মহামাণিক্য ছিলেন ধর্মমাণিক্যের পিতা এবং পঞ্চদশ শতকে ধর্মমাণিক্যের শাসনকালেই (১৪৩১- ১৪৬২ খ্রীঃ) 'রাজমালা' রচিত হয়েছিল। রেভারেন্ড লঙ্ সাহেবও লিখেছিলেন—

> "The Rajmala is a curiosity as presenting us with the oldest speciman of Bengali Composition extant, the first part of it having been complied in the beginning of the 15th century, the subsequent portions were composed at a more recent date. We may consider this then as the most ancient work in Bengali that has come down to us, as the Chaitanya Charitamrita was not written before 1557 and Kritibas subsequently translated the Ramayana."
> [Analysis of the Rajmala or chronicles of Tripura - 1923 A.D. - 1332 T. E., Page-4]

তাই ত্রিপুরবংশাবলী অনুযায়ী, ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মহামাণিক্যের রাজত্বকাল ছিল। রাজমালার তথ্যমতে, ১৮৪ জন রাজা-মহারাজার (সংখ্যাতত্ত্বটি বিতর্কিত) মধ্যে মহারাজা মহামাণিক্য ছিলেন ১৪৮তম এবং আলোচ্য কবি মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর ছিলেন ১৮১তম, ঈশানচন্দ্রমাণিক্যর পরবর্তী, তাঁর রাজত্বকাল (১৮৬২-১৮৯৬ খ্রীঃ) 'ত্রিপুরার স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য স্বয়ং ছিলেন কবি, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর, ফটোগ্রাফার; তাঁর সময়পর্ব থেকেই ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের সূচনা (১৮৫০ খ্রীঃ-বর্তমান) বলে ধরা হয়। আইন, প্রশাসন, শিক্ষা, সমাজ সংস্কারের সমান্তরালে অসাধারণ পান্ডিত্যে একাধিক কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন; রাজকীয় সুষমায়, শব্দঝঙ্কারে, অলংকারে ও ছান্দিক মাধুর্যতায় সেগুলি নিঃসন্দেহেই দরবারী সাহিত্য হয়ে উঠেছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, বাংলা ভাষায় একনিষ্ঠ এই সেবক, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থটি মুদ্রিত করার জন্য অর্থ সাহায্য করেন, বৈষ্ণব পন্ডিত স্বর্গীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত (বহরমপুর থেকে) অনুদিত ভাগবত গ্রন্থের মুদ্রণ-প্রচার-বিনামূল্যে বিতরণ করেন, কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী সংকলিত 'গীতচন্দ্রোদয়' পদাবলী গ্রন্থের "অষ্টকাল রাগানুরাগ" খন্ড পর্যন্ত মুদ্রিতও করেন। আন্তরিকতা ও বিদগ্ধতার সমন্বয়ে তাঁর রচিত প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ-ই উজ্জ্বল।

রাজকীয় পরিমন্ডলে লালিত হয়েও কবিমনে দীর্ঘদিন ধরেই বৈষ্ণবীয় তত্ত্বসাধনা, দর্শন, রাধা-কৃষ্ণের রাসলীলা, গৌরাঙ্গের রাধাভাব সম্পর্কে ভক্তিচেতনা সক্রিয় ছিল; তারই স্ফূরন ঘটে ১৮৯২ খ্রীঃ রচিত "শ্রীশ্রীঝুলন গীতি" এবং ঠিক পূর্ববর্তী "হোরিকাব্য"-কে কেন্দ্র করে। আধ্যাত্মিক ভাবনায় পর্যায়ক্রমিক রাধা-কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসকেই উপস্থাপন করেছেন কবি এই কাব্যদ্বয়ে। যদিও শ্রেণিগত বিচারে উভয়েই পদাবলী সাহিত্যের অন্তর্গত; তবুও ললিতরাগে রাধাকৃষ্ণ-গৌরের ভাবনায়-ভজনায় রাজকীয় আবেগ-মূর্ছনা ধরা পড়েছে। প্রকৃতিকে আলম্বন বিভাবরূপে অঙ্কন করে পদে পদে আলংকারিক শব্দযোজন চরমতম রূপ পেয়েছে। বিচিত্রভাব-রস-রূপের চিত্রকল্পে দুটি কাব্যগ্রন্থের-ই মূল্য অসাধারণ।

জীবাত্মা মুক্তি খোঁজে পরমাত্মাকে বন্দনা করে। পরমপ্রিয় ঈশ্বরের আরাধনার মধ্যে দিয়েই সাধকের সাধনার সার্থকতা। বৈষ্ণবীয় ধারণায় মানবমুক্তির একমাত্র পথ পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, সেবা। তাই তো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি কখনও হয় পরমাত্মার প্রতীক, সেবক নিছকই কবি, দাস মাত্র; কিংবা অতি সাধারণ মানুষ। জীবাত্মারূপী সেই মানুষ সংসার সমুদ্রে থেকেও মুক্তির স্বাদ পায় ঈশ্বর চিন্তায়-ঈশ্বর বিশ্বাসে, এ তো গেল তত্ত্বকথা কিন্তু, কোন মহারাজা যদি কামনা-বাসনা-লোভ-বিষয়াদি মন থেকে পরিত্যাগ করে পরমাত্মার সেবায় নিযুক্ত হন কিংবা ভক্তিনিবেদিত হৃদয়মনের প্রার্থনা ঈশ্বরচরণে পদাবলী আকারে প্রকাশ করেন, তখন কি তাঁকে প্রকৃত মহারাজাধিরাজ বলা চলে! তিনি তো তখন বৈষ্ণবীয় অর্থে সার্থক সাধক। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরও ছিলেন এমনই সত্যনিষ্ঠ পূজারী, কবি। পরমশ্রদ্ধায় রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির উপাসনা করেছেন। 'ঝুলন' এবং 'হোরি' কাব্যদুটিই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অসংখ্য পদাবলীর সন্নিবেশে কাব্যদ্বয় বৈষ্ণবীয় ভাবচেতনার দ্যোতক। বৈষ্ণবীয় চিন্তা-চেতনাকে অন্তরে সাদরে গ্রহণ করে, পদরচনার মধ্যে দিয়ে মুক্তির আস্বাদ পেতে চেয়েছিলেন।

বৈষ্ণবীয় ভাবনার আলোকে তাঁর 'ঝুলন' কাব্যটি সর্বপ্রথম আলোচনা করা যায়। রাজকীয় গাম্ভীর্য ও সংস্কৃতের ধ্রুপদী চেতনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এ কাব্যে। পরমাত্মার প্রতি ভক্তি নিবেদনের পাশাপাশি মহারাণী ভানুমতী দেবীর প্রতিও শোকসন্তপ্ত অন্তরের বেদনা ঝরে পড়েছে এ কাব্যে। বৈষ্ণবীয় দর্শনে, রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি ভক্তহৃদয়ের চিন্তা-চেতনায় হয়ে ওঠে পরমাত্মার প্রতীক। তাই তো ভক্তপ্রাণ নিজেকে দাসরূপে চিহ্নিত করে, তিল-তুলসীর মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের অনুচ্চারিত ধ্বনি প্রকাশ করেন পরমাত্মার প্রতি। নিবেদন করেন মানস অভীপ্সা প্রার্থনা করে। চিরজীবন সংসার সমুদ্রে পরিব্যাপ্ত মানবমন মুক্তি প্রার্থনা করে ঈশ্বরের

কাছে। তাই ভক্ত-সেবক মনের কাছে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার পদযুগলের আশ্রয়তেই সর্বাধিক তৃপ্তি। 'ঝুলন' কাব্যগ্রন্থের একাধিক পদের ভাবনাও উক্ত ভক্তপ্রাণের-চেতনার সমসাদৃশ্য। এখানেও ভক্তরাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য স্বয়ং সাংসারিক বন্ধন কাটিয়ে মুক্তির আস্বাদ খুঁজেছেন, আপনাকে সঁপে দিয়ে পরমাত্মার নিগূঢ় সাধনায়। তাই তো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির কাছে প্রার্থনা করেছেন; নিবেদন করেছেন আপন হৃদয়যন্ত্রণা এভাবে—

"পাঁজরে বিষের জ্বালা হিয়ার অনল হে,
ঝলকি ঝলকি উঠে জ্বলে,
উঠিতে পড়িয়া যাই পায়ে মোর বাঁধা নাথ,
বিষয়ের পাষাণ শিকলে।
কাটি এ করমডোর-বজরের বাঁধ হে,
বীরচন্দ্র দাসে রাখ পায় ।"[১]

এ যেন বৈষ্ণবকবির ভক্তমনের আকৃতি। বিষয় সম্পত্তির পাশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পরা ভক্তপ্রাণের আর্তআবেদন। এ পদে কবি অনুভব করেছেন, একমাত্র আমৃত্যু পরমাত্মার সেবায় নিয়োজিত হতে পারলেই তিনি পরম শান্তি-মুক্তির স্বাদ পেতে পারেন। তাই তো মানসিক সান্তনা পেতে চেয়েছেন পত্নী বিয়োগের পর এভাবে ঈশ্বর সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন থেকে। ভক্তমনের একমাত্র অভীপ্সা: "যে কদিন বাঁচি আর শ্রীবৃন্দাবিপিনে নাথ/থাকি যেন যুগল সেবায়।"[২] এ যেন বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদের আকাঙ্ক্ষা কিংবা চন্ডীদাসের নিবেদনের পদের আত্মসমর্পণ। সচেতন জগতের বন্ধন-সম্পর্ক থেকে মন-মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ঈশ্বরের পদে আত্মসমর্পণ প্রজাবৎসল, কর্মানুরাগী, রাজপদে মর্যাদার সঙ্গে অধিষ্ঠিত মহারাজার অন্তর সাধনা যে এতটা সত্যনিষ্ঠ হতে পারে, তা কাব্যটির প্রতিপদেই প্রকাশিত। শুধুমাত্র অন্তরমননের বেদনার বর্হিপ্রকাশই নয়, রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের বর্ণনাও এ কাব্যের অন্যতম বিষয়। নিভৃত প্রকৃতিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা সাঙ্গ হচ্ছে। যুগলমূর্তিকে কেন্দ্রে রেখে সখীগণের নৃত্যগীতে মুখরিত প্রকৃতিরাজি; রাধিকার লজ্জাবনত মুখমন্ডলের দ্যুতিতে শৃঙ্গাররসের মাদকতা। রাধিকার অপার্থিব সৌন্দর্য বর্ণনায় তাই বাংলাভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত স্থান করে নিয়েছে। মহারাজা সংস্কৃতশ্লোকে সূক্ষ্ম বর্ণনা করেছেন রাধিকার সৌন্দর্য শোভার। যেমন—

১) "লোলাপাঙ্গ সকাম হাস ললিতা নৃত্যন্তি গোপাঙ্গনাঃ
মধ্যাকম্পতয়া স্থলৎকারিকাবেণী শ্লথং কম্পতে।"[৩]

২) "মৃদুহাস্যসুধাময় চন্দ্রমুখং।
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং ।"[৪]

বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন রাধিকার রূপবর্ণনা রয়েছে; দৃষ্টান্ত, স্থির বিদ্যুৎরেখার মত অঙ্গশোভা, নেত্রচঞ্চলা হরিনীর ক্ষিপ্ত গতির ন্যায়, হেমকান্তি দ্যুতিতে রাধা পরিপূর্ণা যুবতী, তেমনই 'ঝুলন' কাব্যেও একাধিক পদে শ্রীরাধিকার সৌন্দর্যবন্দনা বিদ্যাপতি-চন্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখকেই স্মরণ করায়। শুধুমাত্র রাধিকার রূপবর্ণনাই নয়, নবঘন শ্যাম শোভার তারিফও কবি করেছেন। চূড়াশোভিত, পীতাম্বর কটিদেশে, মুকুটখচিত কেশে শিখীপুচ্ছের সৌন্দর্য যেন অন্যমাত্রা পেয়েছে একাধিক পদে। উৎসবমুখর পরিবেশের সঙ্গে এ সৌন্দর্য সমার্থক হয়ে উঠেছে । কবির রচিত একাধিক পদেই এ সৌন্দর্য লভ্য। দৃষ্টান্ত—

(১) "ঐ দেখরে নাগর ঝুলিছে ডালে
চূড়াটি বামেতে হেলে,
নবমেঘে যৈছে ইন্দ্রধনুকের শোভারে।"[৫]

২) "নীলনব জলদ রুচি রুচি রুচির সুন্দর

পীত বটি কটিতটে সুসাজে।
মুকুট পরি খচিত শিখী পুচ্ছে নবমল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে ।"[৬]

'ঝুলন' অর্থে মানসচক্ষে পূর্ণপূর্ণিমার প্লাবনে নিকুঞ্জ কাননে রাধাকৃষ্ণের দোদুল্যমান যুগলমূর্তি বিরাজিত। তাকে বেষ্টন করে আছে সখীবৃন্দ। তাই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সৌন্দর্যশোভা তো কবিকে আপ্লুত করবেই; তাই কবিও লিখবেন— "সযতনে আগুবাড়ি প্যারীর হাত ধরি,/আপন উরপর রাখি,/নিজকর পংকজে পদযুগ মুছই/হেরত অনিমিখ আঁখি।"[৭] ঝুলনে মিলনকুঞ্জ নানারূপ রত্নশোভায় শোভিত, পুষ্পরাজির গাঁথনি তাকে অধিক মনোরম করে তুলেছে। প্রকৃতি এসেছে উদ্দীপন বিভাবরূপে; কখনও প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষে; যেমনঃ "যমুনা বহতছি কলকল নাদে।/নাচত শিখিকুল কতহি সুছাঁদে।/অম্বরে উমরু চলু নব মেহা।/চমকত দামিনী কাপায়ে দেহা।"[৮] কিংবা "চৌদিকে দামিনী দহন বিথার,/হেরইতে উচকই লোচন-তার।"[৯] তবে প্রকৃতির কুঞ্জে, ঝুলনে রাধা-কৃষ্ণ যুগলমূর্তির রূপে প্রকৃতিও আত্ম নিবেদন করে পূর্ণ সৌন্দর্যের সাক্ষী হতে পেরেছে । কবির একাধিক পদেই প্রকৃতি তাই সাক্ষী থেকেছে ঝুলনের । যেমন—

"বরিখ চাঁদিনী আধ মলিনিমা
রসবিহারের নিশি আজিরে,
হইয়া কৌতুকী ঠমকি মুচকি
হাসিতেছে যেন বনরাজিরে।
মেঘ সুরসিয়া ঈষৎ বর্ষিয়া
প্রেম বিন্দু বিন্দু যেন ঝরিছে,
ঐছন সময়ে রসবতীলয়ে
রসিক-নাগর ঝুলিছে ।"[১০]

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য ছিলেন বৈষ্ণবীয় ভাব সাধনার কবি। তাইতো, বৈষ্ণব সেবকদের মতই শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীচৈতন্যের পদযুগলে আশ্রয় কামনা করে মুক্তি চেয়েছেন, পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব কবিদের ভাবানুসারেই নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে আশীর্বাদও প্রার্থনা করেছেন। কবি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়াকে পুন্যময় স্থানরূপেও তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, লীলা যেন কবির মনশ্চক্ষে সত্যনিষ্ঠ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাইতো তিনিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যদেব অভিন্ন, তাই বৈষ্ণবীয় ভাবাপন্ন কবি বলেছেন—

"পুণ্যময় শান্তিপুর, ভকত পর সাধিয়া।
পুণ্যময়, পুণ্যময়, পুণ্যময় নদীয়া।।
গৌরহরি অবতরল, কনক বিধু কাঁতিয়া।
বীরচন্দ্র তছুঁচরণ ভজই দিনরাতিয়া।।"[১১]

বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের গৌরচন্দ্রিকা পদে যেমন হেমকান্ত গৌরাঙ্গের রূপসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে; তেমন-ই কবি বীরচন্দ্রমাণিক্যের লেখনীতেও শ্রীচৈতন্যদেবের অপরূপ সৌন্দর্য প্রতিভাত । দৃষ্টান্ত—

"দেখরে রঙ্গ, গৌরচন্দ্র ঝোলে অপরূপ ভাতিয়া,
অনুপম রূপ নাহিক স্বরূপ,
প্রভাত অরুণ জিনিয়া।"[১২]

গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য যে নিকষিত হেমসুধা, তা যেন প্রত্যক্ষ করা যায় কবির পদগুলিতে, তাই তো 'ঝুলন'

কাব্যটির অন্তরে যতই কবিমনের বিরহ ব্যাকুলতার আর্তচিত্র চিহ্নিত থাকুক না কেন, এ কাব্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিও শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ সৌন্দর্যও উপেক্ষনীয় নয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদের ভাব-ভাবনা, রীতি অনুসরণেই কবি পেয়েছিলেন রসদ; তাই বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রতি আন্তরিক-শ্রদ্ধাবানও তিনি ছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে 'ঝুলন' কাব্যের সূচনাংশে—"ঝুলন গীতি মহাজন পদাবলীর ছায়া লইয়া লিখিত।"[১৩] তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব ভাব-ভাবনায় অনুরণিত কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যগ্রন্থ 'ঝুলন'।

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হোরি'। ত্রিপুরা রাজ্যে ফাল্গুন পূর্ণিমায় সুবাসিত আবীর সহকারে বিচিত্র মিলনোৎসব। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যমন্ডিত এ উৎসব পূর্বে ত্রিপুরার মহারাজারা বংশ পরম্পরায় আন্তরিকভাবে মেতে উঠতেন; রাজমহল, প্রত্যেকের দেওয়া সুবাসিত আবীরে ঝলমল করে উঠতো। সমস্ত দিনরাত্রি জুড়ে রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক সংগীতও পরিবেশিত হতো। সমস্ত রাজকীয় সংস্কার-অহংকার পরিত্যাগ করে অতিসাধারণ মানুষের সাথে হোরি উৎসবে মেতে উঠতো ত্রিপুরার রাজবাড়ি, ভক্তি ও আন্তরিকতায় রাধাকৃষ্ণের চরণেও দেওয়া হতো আবীররেখা। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বৈষ্ণবীয় চেতনায়, ভক্তহৃদয়ের আকৃতি স্বরচিত সঙ্গীতের মাধ্যমেও নিবেদন করতেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সামনে। সর্বমোট ৩৪টি সঙ্গীত পরবর্তীকালে 'হোরি' কাব্যে সংযোজিত হয়েছিল প্রবল নিষ্ঠায়। প্রত্যেকটি সঙ্গীতই বৈষ্ণবীয় ভাব-ভাবনা, চেতনা সমৃদ্ধ।

'হোরি' কাব্যটির মধ্যে উৎসব কেন্দ্রিক সংগীত এর পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণকেন্দ্রিক সংগীত, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও স্থান পেয়েছে। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; গৌরাঙ্গের ভজনা বিষয়ক পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ভক্তহৃদয়ের আকুতি স্থান পেয়েছে। পদাবলী সাহিত্যের রীতি মেনেই সংস্কৃত ভাষায় গৌরসাধনা করা হয়েছে কাব্যটির সূচনায়। পদটিতে উঠে এসেছে কৃষ্ণ, রাধা, ললিতা, বিশাখার প্রসঙ্গও—

"সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান্ সহগণ-ললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"[১৪]

এই গৌরভজনা সংগীত এর মধ্যে দিয়েও প্রতিফলিত হয়েছে । এরকম একটি সংগীত—

"একি আনন্দ শ্রী গৌরাঙ্গ চরনে বন্দন মন।
ত্বরিতে সিন্ধু পদার বিন্দু হৃদে কর অবলম্বন।"[১৫]

কবি-ভাবনায় কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব অভিন্ন ছিলেন। তাইতো, চৈতন্যের রাধাভাবের পদগুলিও যথেষ্ট শিল্পোৎকৃষ্ট; কিছু পদে তো প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের পূর্বকালের স্মৃতি জাগরিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে—

১) "পূরব কালের খেলা মনেতে হইল।
হা হা প্রাননাথ বলি কাঁদিতে লাগিল ।"[১৬]

'হোরি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর পর্যায়গত সাদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রত্যেক পর্যায়ক্রম কবি অনুসরণ করেন নি । শুধুমাত্র 'অভিসার', 'মিলন' ও 'রাসলীলার' পদই রচনা করেছেন। এই সকল পদপর্যায়ের সাদৃশ্যগত বিষয় হয়েছে রাধা, কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির সৌন্দর্য আরাধনা। বৈষ্ণব কবিদের মতনই ষোড়শী যৌবনাবতী রাধিকার অঙ্গশোভা এই সৌন্দর্যবন্দনার বিষয় হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

১) "সমান ষোড়শী সমান রূপসী
নবীন মালা সঙ্গিনী সঙ্গে
অঙ্গের আভরণ কাঁচলী বন্ধন

সমান সমান বেনী ঝুলিছে অঙ্গে।"[১৭]

২) চরন চালনে দোলিছে দোলনে
হেমপৃষ্ঠে বেণী সঘন ঘন
কর্ণে কুন্ডল মনি ঝলমল
যেমন সৌদামিনী ঝলকে ঘন।" [১৮]

'মিলন' পর্যায়ের পদগুলিতেও বৈষ্ণব পদাবলীর মতই প্রকৃতি উদ্দীপন বিভাবের কাজ করেছে, শৃঙ্গার রসের ভাবকে প্রকৃতির সক্রিয়তায় অনুভব করেছেন রাধা । দৃষ্টান্ত—

"আজু অপরূপ বৃন্দাবিপিনকি মাঝে,
বিহরই ঋতুরাজ মনোহর সাজে ।"[১৯]

হোরি উৎসবকে কেন্দ্র করে সুবাসিত ফাগের আবীরে, 'রাসলীলা'-র অন্তর্গত পদগুলি সত্যই মূল্যবান। কারণ, বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রায় সমতুল্য মহারাজা বীরচন্দ্রের কবি প্রতিভা, এই প্রতিভায় শৃঙ্গার রসের ফল্গুধারায় সৃষ্টি হয়েছে পদগুলি। প্রত্যেকটি পদই সহজ-সরল-প্রাণবন্ত। প্রাধান্য পেয়েছে এক্ষেত্রেও কৃষ্ণ, রাধার রূপবর্ণনা কিংবা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির রূপৈশ্বর্যের বন্দনা, আবীরের রাগে হোরি উৎসবে রাধাকৃষ্ণের যুগলক্রীড়া উপভোগ্য হয়েছে—

"রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,
আঁচল সঁঞে ফাগু লেই কুঁয়রী।
হাসিহাসি রসবতী মদন তরঙ্গে,
দেয়ল আবির রসময় অঙ্গে ।
সুচতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী,
মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী।"[২০]

পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব কবিদের সমভাবনাতেই কৃষ্ণের রূপবর্ণনাও করেছেন। দৃষ্টান্ত—

১) "নব নীরদ নীল সুঠাম তনু,
শিখিপুচ্ছ শিরে জিনি ইন্দ্রধনু।
অধরোজ্জ্বল রক্তিম বিম্ব জানি,
গলে শোভিত মোতিম-হার মনি।"[২১]

কিংবা—

২) "নব নীরদ নিন্দি সুনীল তনু,
তাহে কুন্তল ঝলকত বিজুরী জনু
কুন্তল মণিময় গন্তে বিরাজে,
দামিনী ঝলকত মত ইহ সাজে।
মণিময় নুপূর শ্রীপদে বাওয়ে ।"[২২]

রাধিকা কবিদৃষ্টিতে বিকাশিত যৌবনের প্রতীক। শত কোটি চন্দ্রের ন্যায় তার মুখের শোভা, চকোর রূপ চোখের সতত চঞ্চলা দৃষ্টিতে কৃষ্ণকে অনুধাবন করে। যেন—

"তরুন অরুণ রুচি রঞ্জিত ও সিন্দুর ভাল সুধাকরকাঁতি
সো ঘন তিমির চিকুর বিচুম্বিত
ইহ অতি অপরূপ ভাতি।"[২৩]

২) "কর্ণে কুন্ডল মনি ঝলমল
যেমন সৌদামিনী ঝলকে ঘন।"[২৪]

রাধিকার এরূপ সৌন্দর্যের বিবরণ বৈষ্ণব পদাবলীতেও লভ্য। আবার, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সৌন্দর্যবন্দনা কাবদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে প্রলুব্ধকর। দৃষ্টান্ত—

"কিবা ইন্দ্রধনু আভা শোভে চূড়া মনোলোভে,
দুলিতেছে মৃদুমন্দ বায়ে,
যুগল অধরে হাসি কত শশী পরু খসি,
কত কত কাম মরুছায়ে।"[২৫]

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন অন্তরমননে খাঁটি বৈষ্ণব। সাধনার মধ্যে দিয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে মুক্তি পেতে চেয়েছেন তিনিও। তাইতো বৈষ্ণব পদকর্তাদের মতই তিনিও রাধাকৃষ্ণের রূপবন্দনার পাশাপাশি ভক্তমনের আকৃতিও নিবেদন করতে চেয়েছেন। তাই 'হোরি', 'ঝুলন' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে যে হেমকান্তি মনোলোভা আরাধনা দেখা গেছে, তা সত্য-বিশ্বস্ত-খাঁটি। শ্যাম নামে আত্মমন বিসর্জন দিয়ে খাঁটি বৈষ্ণব পদকর্তা হয়ে উঠেছেন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাই উক্তদুটি কাব্যের বৈষ্ণবীর ভাব-ভাবনা-চেতনা সুবাসিত, শীতল চন্দনের ন্যায়।

আধুনিক গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯-শে ডিসেম্বর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয় ও চতুর্থ কাব্যদ্বয় যথাক্রমে 'প্রেম মরীচিকা' ও 'উচ্ছ্বাস'– উভয়েরই রচনাকাল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোন সময়পর্ব, তবে পৃথকভাবে কাব্যদ্বয়ের নির্দিষ্ট রচনাকাল জানা যায় নি, উক্ত প্রত্যেকটি কাব্যই যে প্রিয়া-বিরহের মর্মবেদনার সাক্ষ্য বহন করছে- তাতে কোন দ্বিমত নেই। প্রত্যেকটি কাব্যেই বিশেষ সমার্থক ভাবনা তাই প্রতিফলিত হয়েছে। দুঃসহ জীবনযন্ত্রণার উপলব্ধি থেকেই অন্তর্মননে কাল্পনিক সৌন্দর্য প্রিয়ার বিচিত্র রূপ প্রতিভাত হয়েছে। হৃদিপ্রিয়াও তাই পত্নীর বিয়োগব্যাথার মর্মবেদনাকেই দ্যোতিত করেছে। প্রতি ছত্রেই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রতিভাত হয়েছে। এই নিরিখেই কাব্যগুলিও গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে ।

'সারদামঙ্গল'-এর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী স্বয়ং লিখেছেন—

"মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতী বিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল রচনা করি।"[২৬]

কবির বন্ধুবর পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্রের মৃত্যুজনিত বিয়োগব্যাথা এবং প্রিয়তমা পত্নী অভয়াদেবীর মৃত্যুই যেন পুঞ্জীভূত হয়ে এ কাব্যে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। এর সাথে কবিমননে কাব্যরচনার প্রেরণাহীনতার যন্ত্রণাও সংযুক্ত হয়েছে। চিরন্তন সৌন্দর্যময়ী সারদা অলৌকিক জ্যোতির্ময়ীরূপে কাব্যে আবির্ভূত হয়েছে। ব্যক্তি চিত্তের অভূতপূর্ব চেতনা, কাল্পনিক সৌন্দর্যমূর্তি রূপে বিকশিত হয়েছে। বন্ধুবিরহ, পত্নীবিরহ ও সরস্বতীবিরহ সঞ্জাত শূন্যতা পূর্ণ হয়েছে পরম প্রাপ্তির আনন্দধারায়, পক্ষান্তরে, বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথমা পত্নী ভানুমতী দেবীর মৃত্যুজনিত কারণে কবিমনের শোকোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়েছে 'প্রেম মরীচিকা' ও 'উচ্ছ্বাস' কাব্যদ্বয়কে কেন্দ্র করে। জীবনের গভীর বেদনারহস্য কবিমনন-এ সৃষ্টি করেছে শাশ্বত প্রেমের উপলব্ধি। পত্নী শোকে সন্তপ্ত কবিহৃদয়। প্রেরণাদাত্রীকে হারানোর যন্ত্রণা কাব্যটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করেছেন। এ কাব্যদ্বয়ে হয়ত বা সারদার মত কবিমানসীর-সৌন্দর্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধান নেই; কিন্তু কবিচিত্তে অপ্রাপ্তিজনিত চেতনার পরমশান্তিবোধ রয়েছে। কাব্যদ্বয়ের মধ্যে 'সারদামঙ্গল'-এর মতই প্রকৃতির নিবিড় বন্দনা স্পষ্ট, মর্মবেদনা অগাধ সৌন্দর্যলোকে অবগাহন করে কাবমনকে প্রশান্তির স্তরে নিয়ে গেছে। সর্বাত্মক অনস্তিত্বের হাহাকার অবশেষে

শাশ্বত প্রেমের উপলব্ধি জাগিয়ে তুলেছে। গীতিকবিতার মূর্ছনায় হৃদয়োপলব্ধির অনন্ত প্রকাশ ঘটেছে।

বীরচন্দ্র মাণিক্য 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যটিতে 'সারদামঙ্গল'-এর মতই 'উপহার' অংশটি সংযোজিত হয়েছে কাব্যপ্রারম্ভে। 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যে রয়েছে—

"তোমার সঁপিতে এই, কবিতা কুসুম-হার,
.....
কাঁদিয়া গাঁথিনু এই হার,
হৃদে স্থান দিতে একবার, অশ্রুমাখা এই উপহার ।"[২৭]

অনুরূপ, 'সারদামঙ্গল' কাব্য—

"নয়ন অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার।
জীবন জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার।
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—
ধর, ধর, স্নেহ্-উপহার!"[২৮]

বিরহজর্জরিত কবির ব্যক্তিচিত্তের গভীর উপলব্ধি জগতের সৌন্দর্য স্বরূপের মূলীভূত রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে এ কাব্যে।

পত্নী হারানোর পর কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের মনে হয়েছে প্রেম মরীচিকার ন্যায়; "চিনিনু চিনিনু এবে প্রেম-মরীচিকা।"[২৯] এবং "প্রেম চপলার খেলা প্রেম-মরীচিকা।"[৩০] অনুরূপে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবনাতেও প্রেমহীন জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা-দ্বন্দ্বময়তা যেন মরুভূমির মতই; চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ধূম্ররাশির মধ্যে মরীচিকার ভ্রম থাকলেও শাশ্বত সত্যটি হল বিষম বিরহবোধ—

'মরু-মরু-মরুময় জীবন-লহরী!
এ বিরস মরুভূমে—
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল!
কভু মরীচিকা-মাঝে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল!"[৩১]

পক্ষান্তরে, রাজা-কবি বিভ্রান্ত পথিকের মতই মরুপথের মরীচিকায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভেবেছেন—

"আমার এ ভালবাসা, রূপ-মোহ একি,
ভুলিনু শুধু কি তার রূপ নিরখিয়া।"[৩২]

তাই উভয় কবিই মৃত্যুকে আহবান জানিয়ে পরম প্রশান্তি পেতে চেয়েছেন । রাজা কবি আপন মহিষীকে হারানোর বেদনায় যে মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছেন, তা থেকে মুক্তি পেতেই মৃত্যু তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেয় হয়েছে। পক্ষান্তরে, কাব্যলক্ষ্মীকে হারানোর বেদনায় চঞ্চল চিত্তবৃত্তিকে সংহত করতেই কবিও পরম মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন। প্রামাণিক দৃষ্টান্ত—

প্রথমত।। "সে সুখের দিন
আসিবেরে কবে,
শোক তাপ সব ধুয়ে, মরণের সুখ
শীতল কোলেতে,

ঘুমাব মাথাটি থুয়ে।"[৩৩]

দ্বিতীয়ত।। "ধোরো না, ধোরো না, বৃথা রুধো না আমাকে!
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ-পাখী,
দেখুক, দেখুক, যদি আর কিছু থাকে!
ছাড়! আন! যাও যাও!
বেগে বুকে বিঁধে দাও!
ওই সে ত্রিশূল দোলে গগনমন্ডলে!"[৩৪]

চেতনায় এ মৃত্যুচিন্তা দীর্ঘক্ষণ উভয়কবিরই স্থায়ী হয়নি। প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শে পুণরায় ভাবলোকে উদিত হয়েছে শাশ্বত প্রেমের প্রশান্তি। কবি হৃদয়ে প্রকৃতির স্পন্দমান প্রাণপ্রবাহের প্রভাব পড়েছে, নিখিল মানবচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রকৃতিসত্তা বলেই চিরকাল মানবমন প্রশান্তি খোঁজে প্রকৃতির সান্নিধ্যে। উভয় কবিই তাই প্রকৃতির বিভোরিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তাঁদের কাব্যে প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন। আধুনিক গীতি কবিদের মতই প্রকৃতির রূপকে ইন্দ্রিয় নির্ভর চিত্রকল্পে প্রকাশিত করেছেন। দৃষ্টান্ত—

রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্য—

১) "বাহির যেমতি এল ঊষাসতী,
পরিয়ে কিরন-ভূষা,
তেমতি আমার হৃদয় আকাশ
শীতল বিভায় করি পরকাশ
দেখা দিল আসি সুখের ঊষা।"[৩৫]

২) "দেখিতে দেখিতে আবার মহীতে,
চৌদিকে রতন-ভাস,
শিশির রতন, গড়ায়ে গড়ায়ে,
ঘাসের উপর পড়িছে ছড়ায়ে,
কমল-রতনে উজল হাস।"[৩৬]

৩) "শোভিল অটবি-শোভিল মাধবী,
কুসুম ভূষন পরা,
উঠিল মালতী ছাড়িয়ে শয়ন,
কুয়াশার জলে পাখালি নয়ন,
অলি যেন তায় কাজল ভরা।"[৩৭]

বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল—

১) "সুস্বপ্নরূপিনী উনি, ঊষারানী সবে বলে।
বিরল তিমিরজাল,
শুভ্র অভ্র লালে-লাল
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে!"[৩৮]

২) "ফুটে ফুটে অবিরল
হাসে সব শতদল,

অবিরল গুঞ্জরিয়ে ভ্রমর বেড়ায়;"[৩৯]

৩) "ঘোর্ ঘোর সমুদয়,
কি এক রহস্যময়,
শান্তিময়, তৃপ্তিময় ভুলায় নয়ন;
অনন্ত বরষাকালে
অনন্ত জলদজালে
লুকায়ে রেখেছে যেন জ্বলন্ত তপন![৪০]

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য স্ত্রী হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে জগৎ-জীবনের শূণ্যতা হৃদয়মাঝে অনুভব করেছেন। বাস্তব তাঁর কাছে অনেক বেশী কঠিন-দৃঢ়, তুলনায় সুখ মায়ার নামান্তর। তাই তো প্রেয়সীকে পুণর্বার ফিরে পেতে চেয়েছেন। আকাঙ্ক্ষা-আশায় ভরা জীবন কবির শেষ হয়ে যায় নি। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের মধ্যেও মিষ্টিসিজম্ চেতনার পর রোমান্টিসিজমের ভাবালুতা ফিরে ফিরে এসেছে। তাইতো কবি বিহারী লাল চক্রবর্তীর জীবন যতই যন্ত্রণাদায়ক-বেদনাময় হোক না কেন, সেখানেও সারদার কাল্পনিক অনুভবে-অনুধ্যান জেগে উঠেছে মায়াময় জগৎ। এই জগতেই তিনিও সারদাকে ফিরে ফিরে চেয়েছেন। তাইতো উভয় কবিই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে ভরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমকে পেতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত—

"চাহিনা মুকতি আমি-চাহি এই ধামে,
অনন্ত নিবাস,
মন যারে চাহে সদা, তারিসহ মনে মনে,
মিশিতে অসীমে অভিলাষ,
চাহিনা সে প্রেম উপাসিতে, যেই নিরাকার
—রূপ উপাসনাময়ী বাসনা আমার।"[৪১]

পক্ষান্তরে—"যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি;"[৪২]

'সারদামঙ্গল' কাব্যে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী যেমন বাল্মীকির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন কাব্য প্রারম্ভেই; তেমনই রাজা- কবিও বাল্মীকির রামায়ণ প্রসঙ্গ এনেছেন শ্রীরামচন্দ্রের বিরহব্যাকুল মনের অবস্থার পরিচয় দিতে-এরই সঙ্গে নিজের অতীত জীবনের যন্ত্রণা একাত্ম হয়ে গেছে; "ফিরি ফিরি বনে বনে,/কাঁদিল অনুজ সনে,"[৪৩] সারদামঙ্গলের কবি সারদার স্বরূপ অন্বেষণে শিব-পার্বতীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন; তেমনই, এ কাব্যেও কালিদাসের 'মেঘদূত,' 'কুমারসম্ভব'-এর শিব-পার্বতীর উল্লেখ রয়েছে । বিশেষত 'কুমার সম্ভব'-এ পার্বতী লাভের জন্য স্বয়ং মহেশ্বর যোগী হয়ে ধ্যান করছেন; এখানেও মদনের পঞ্চপুস্পবাণ আর রতির শোকোচ্ছাস মনকে কষ্ট দেয়—

"হৃদি মাঝে প্রিয়ারে ধেয়ায়,
তপ সাধনের বলে,
কালে সুধা-ফল ফলে
হারানিধি প্রিয়া পুণরায়,
কুসুম শরের সহ আসি দেখা দিল,"[৪৪]

সম্পূর্ণ কবিচিত্তের ব্যঞ্জনা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ বহির্প্রকাশ 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যটি । ব্যক্তিহৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণার

অনুভূতি-উপলব্ধিই, বেদনার ব্যঞ্জনায়, গীতিকবিতার মূর্ছনায় ধরা পড়েছে। এরই সাথে প্রকৃতির সুনিবিড় জগতে কবিমন প্রশান্তি পেতে চেয়েছে। উভয় কবিই আপন-আপন স্ত্রীকে হারিয়ে জ্বালাময় অভিব্যক্তি বিশ্বপ্রকৃতির প্রেক্ষাপটে দ্যোতিত করে পরমশান্তি পেতে চেয়েছেন। তাইতো, ভাবনার দৃঢ়তায় কখনও প্রেয়সী, কখনও শ্রেয়সীরূপে অখন্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-দেবীর আরাধনা করে গেছেন। তবে নিঃসন্দেহেই— "এই প্রেম স্পর্শাতীত এবং বাস্তব-বহির্ভূত কল্পনাপ্রসূত।"[৪৫]

—এই ভাবনার দোলায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যটিও অনবদ্য। প্রামাণিক সত্যতা হিসেবে বলা যায় তাই;

"নরলোকে যেই প্রেম ইন্দ্রিয় মিলনে, ছিল কলুষিত।
বিমল স্বরগধামে পরশি ইন্দ্রিয় মালা
সে প্রেম হবে না ত অপবিতা।"[৪৬]

পক্ষান্তরে, সারদামঙ্গলে—

"কিবে এক পরিমল/বহে বহে অবিরল...
অমল কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে ।"[৪৭]

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর স্পর্শাতীত, 'বাস্তব-বহির্ভূত কল্পনাপ্রসূত' প্রেমচেতনার তাই সাদৃশ্যতা বোধ রয়েছে। ব্যক্তি প্রেমের অতৃপ্তি-হাহাকার এবং জীবনযন্ত্রণা অপর কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' শোককাব্যেও প্রতিভাত হয়েছে। পত্নীবিয়োগ (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে) কবিকে পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যরচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। অক্ষয়কুমার বড়ালের অন্তহীন হাহাকারে অনুরণিত হয়েছে ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখের সান্তনাহীন স্মৃতি; ইন্দ্রিয়সর্বস্ব প্রেম ও মর্ত্য পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড়যোগে সম্পৃক্ত কবিসত্তার সঙ্গে তাই সমসাদৃশ্যতাবোধ রয়েছে বীরচন্দ্র মাণিক্যের 'প্রেম মরীচিকা' কাব্যটির। দৃষ্টান্ত;

'প্রেম মরীচিকা' কাব্য—

"আমার এ ভালবাসা, রূপ-মোহ একি,
ভুলিনু শুধু কি তার রূপ নিরখিয়া,"[৪৮]

অনুরূপ, 'এষা' কাব্যে—

"কি ছিলে আমার তুমি, -প্রেয়সীনা ক্রীতদাসী?
দুটি হাতে সেবাভরা, বুকে ভরা প্রেমরাশি।"[৪৯]

জীবনের গভীর উপলব্ধিবোধ ও ব্যক্তি চেতনার হাহাকারই কবিচিত্ত দ্বয়ে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। যা গীতি কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ভাবনায় উৎসারিত হয়েছে— "লিপির আকারে মোর চির অশ্রুধার,/ কবিতার রূপে মোর চির হাহাকার।"[৫০] পক্ষান্তরে, কবি অক্ষয়কুমারের চেতনায় অবিশ্বাস্য ছিল পত্নীবিয়োগের চরম সত্যটি। কবি তাই প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেন— "ত্যজিয়াছ মর্তভূমি/তবু আছ-আছ তুমি/তুমি নাই কোথা নাই হয় না বিশ্বাস।"[৫১] কবির সংযত-শান্ত, শোক বিহবল মনন যেন পত্নী হারানোর যন্ত্রণায় এতটা সংবেদনশীল যে গীতিকবিতার স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাই নিদারুণ যন্ত্রণায় কাতরকণ্ঠে কবির শাশ্বত ভাবনা—"মরণে কি মরে প্রেম? অনলে কি পুড়ে প্রাণ?"[৫২] কবির এই সত্য উপলব্ধি অনেকটা স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে ভিন্ন রূপে রাজা কবির কাব্যে ধরা পড়লেও, ভাবনার সাদৃশ্যতাবোধ রয়েছে; যা হল অব্যক্ত যন্ত্রণা ও জীবনের শাশ্বত সত্যবোধ— "দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে, রহিবে অংকিত শত বরষের পরে।"[৫৩]

'এষা' কাব্যের অন্তিমেও দেখা গেছে, কবিমন ঈশ্বরচেতনায় পরমশান্তি লাভ করতে চেয়েছেন। 'সারদামঙ্গল' এর কবি তো কাব্যশেষে 'শান্তি' অংশ সংযুক্ত করেছেন। এ স্থলে ব্যক্তিশোক স্থিমিত হয়ে অশ্রুবেদনা বিশ্বব্যাপি

প্রসারিত হয়েছে; আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্তিরেকে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যদ্বয়ে ফুটে উঠেছে স্পষ্ট আত্মগত স্পন্দন; যার উত্তোরণ ঘটেছে কাব্যশেষে প্রকৃতি সান্নিধ্যে সমাচ্ছন্নতায় তবে কবিমনে উচ্ছ্বসিত আবেগ-ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে দ্বিতীয়া মহিষী মনোমোহিনী দেবীর সংস্পর্শে। প্রেমের পরম প্রাপ্তিতে যেন এবার কবি অপূর্ব অনুভূতিতে কবিতা সাজিয়ে তুলেছেন। বিগত জীবনের যন্ত্রণা এবং বর্তমানের আনন্দ মিলে মিশে অনুভূতি রাজ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করলেও, অচিরেই তা লোপ পেয়েছে। ভাব ব্যঞ্জনায় নৈরাশ্যের পরিবর্তে নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ ধরা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত—

১) "আধ দুখে আধ সুখ ছিল আবরিয়া,
কি যেন মেঘের কোলে জোছনা রাখিয়া ।"[৫৪]

২) "সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া,
দুঃখের হৃদয়ে আজি, নেশার আধেক ঘোরে
রহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া ।
নয়নে ভাসিছে গত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন ।"[৫৫]

কবির পঞ্চমকাব্য "অকালকুসুম" ১৮৮৬ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পূর্ণ কাব্যটি কান্ত-কান্তার ভাবব্যঞ্জনাকে বিচিত্র পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে একাধিক স্তবকে বিন্যস্ত করে; বিচ্ছিন্ন ভাবরূপকে প্রকাশিত করা হলেও সমগ্রতায় অখন্ড বিষয়ভাবনা প্রাধান্যতা পেয়েছে। মহারাজার ব্যক্তিগত জীবনভাবনা, মূল্যবোধ, জীবন সম্পর্কে দার্শনিক চেতনা যেন ধরা পড়েছে কাব্যটিতে। দরবারী মন-মেজাজ-অহংকারবোধ এ কাব্যটির শৈলীতে উজ্জ্বল;কাল্পনিক সত্তার বিপরীতে বাস্তবিক, ধ্রুপদী চেতনায় কবি কাব্যটি রচনা করেছেন। কবির অপর আর একটি কাব্য "সোহাগ" (১৮৮৩ খ্রীঃ প্রকাশিত) ২২টি দীর্ঘকবিতার সমন্বয়ে সৃষ্টি। কবিমননের পৃথক পৃথক ভাবব্যঞ্জনায়, দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি প্রেম-প্রত্যয়, প্রকৃত ভালোবাসা উৎসর্গীকৃত হয়েছে। সংশয়-অতৃপ্তি থেকে কবিহৃদয় মুক্তি পেয়ে, পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে বিকশিত হয়ে, মহৎ প্রেম স্বর্গীয় দ্যোতনা সঞ্চার করেছে। উক্ত দুটি কাব্য বিশ্লেষণে কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কবিত্ব শক্তির গভীর পরিচয় মেলে। পঞ্চম কাব্যটির ভাবনার সঙ্গে ষষ্ঠ কাব্য ভাবনার নিগূঢ় বন্ধন রয়েছে ।

'অকালকুসুম' কাব্যটি আপাতভাবে ষষ্ঠ স্তবকে বিন্যস্ত হলেও, প্রতিটি স্তবকের অন্তরে ভাবনার বিকাশ-বিস্তার ও উত্তোরণ কাব্যটিকে একসূত্রে বেঁধেছে। নায়ক-নায়িকার অন্তর মননের ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা যেন গীতিকবিতার মূর্ছনা নিয়ে এসেছে। পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে প্রতিটি স্তবক বিন্যস্ত। কাব্যটি কবির দ্বিতীয়া পত্নী মহারানী মনোমোহিনী দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত হলেও প্রথমা পত্নীর স্মৃতিবিজড়িত প্রেম ভাবনা যেন নায়ক-নায়িকার মনোভাবনাকে ঘিরে প্রতীকায়িত হয়েছে। তাই প্রত্যেকটি স্তবকই ঘিরে রয়েছে ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধি-অনুভূতিবোধ; স্তবকগুলি তাই দীর্ঘকবিতার আকার নিয়েছে। কবি যেন একান্তে বসে জীবন অভিজ্ঞতার পুষ্পচয়ন করে মালা গেঁথেছেন। কাব্যটির ভাবনায় তাই দ্যোতিত হয়েছে—

ক) নায়িকার ব্যক্তিগত চিন্তা ও মানস আক্ষেপ,
খ) নায়ককে কেন্দ্র করে নায়িকার ভাববিকাশ ও আক্ষেপ,
গ) নায়কের ব্যক্তিভাবনার উন্মেষ,
ঘ) নায়িকার স্মৃতিরোমন্থন,
ঙ) নায়িকাকে কেন্দ্র করে নায়কের স্বপ্ন-স্মৃতি,
চ) নায়িকার কলঙ্কের স্মৃতি ও নিবেদন।

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন মনে-প্রাণে বৈষ্ণব; তাই 'অকাল কুসুম' গ্রন্থের মধ্যেও চন্ডীদাসের এই পদটি অন্তর্ভূক্ত করেছেন—

"যে জন না জানে পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে
আপনি না বুঝে পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে।"[৫৬]

মহারাজা বীরচন্দ্রের ছদ্মনাম ছিল ললিত মোহন দেববর্মা, এই নামেই কবি এ কাব্যটি রচনা করেছেন মহারাজা সুলভ অহংবোধ কিংবা প্রশংসা-প্রশস্তি এ কাব্যে স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে, নায়িকার ভাববিকাশের ধারার ক্রম উত্তোরণ ঘটেছে মান- অভিমান, আক্ষেপ, স্মৃতিচারণা ও সবশেষে মিলনের উচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করে। অন্তঃসলিলা ব্যক্তি অনুভূতি বিচিত্র প্রেমের রাগকে অবলম্বন করে বিকাশিত হয়েছে।

কান্তার তীব্র বিরহ যন্ত্রণাবোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা; বিরহ যন্ত্রণায় দগ্ধ নায়িকার মনে অনন্ত আগুনের লেলিহান শিখা প্রতিনিয়তই সজীব রয়েছে— "অনন্ত-আগুন-শিখা বুঝি নিবিবে না-/ফুরাবে না বিরহ-বেদনা।"[৫৭] আশা- আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত হয়ে নৈরাশ্যময় জীবনবোধ নায়িকাকে গ্রাস করেছে। একদিন যে মনে করেছিল— "হইব তাহার আমি, সে হবে আমার,/আশাছিল একদিন মিলিব দুজনে"।[৫৮] আজ সে-ই আশাহত হয়ে, নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। জীবনের সর্বশেষ আশা ত্যাগ করে মৃত্যু সংকল্পে দৃঢ় হয়েছে—"জন্ম-শোধ এ পরান দিব বিসর্জন,/ যায়, যাক্ হতাশ জীবন।"[৫৯] নায়িকা জগতের মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে নায়ককেও সমব্যথী করে তুলতে চান—"লিখে দেই তব গায় দুইটি চরণ,/এসো তবে শশধর, নামিয়া ভূতলে,/হেরিলে তোমার পানে, পড়িবে তোমার মনে,/কে লিখিল, কে কাঁদিল কাহার কারণ,/ দেখে তার ঝরিবে নয়ন।"[৬০] প্রতিনিয়ত দুঃখ-সুখের দোলায় জীবন আন্দোলিত। নায়িকার তাই মৃত্যুচেতনা ক্ষণস্থায়ী; পুণরায় জীবন আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার যন্ত্রণাবোধ তার কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছে।

কবি যেন নায়ক-নায়িকার ভাবান্তর-আবেগ এর বিকশিত-পরিণত রূপটি দেখাতে চেয়েছেন। এ কাব্যে কবির ভাবনায় উচ্ছ্বাস-আবেগ ধরা পড়েছে। প্রতিনিয়ত নায়িকার দৃষ্টিতে প্রেমের রূপ পূর্ণতা পেয়েছে। শাশ্বত চেতনায় প্রেম মুকুলিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে অন্বিত হয়ে গেছে । ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা ও পূর্ণ প্রেমের আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে নায়ক-নায়িকার জীবন দোলায়িত। তাই একসময় বিরহী নায়িকা ব্যর্থপ্রেমের কষ্টে জীবন সম্পর্কে বলেছে— "যায় যাক্, ক্ষতি নাই, জীবন আমার,/চাহিনা রাখিতে এই প্রাণ,/হাসিকান্না ভুলে যাই, ভুলি এ জগত, হয় হ'ক হৃদয় পাষাণ।"[৬১] আবার এই নায়িকাই প্রাণ-মন সম্পূর্ণ নায়কের চরণতলে সমর্পণ করার জন্যও প্রস্তুত হয়েছে। প্রেমের শাশ্বতরূপ, মর্যদা সম্পর্কে নায়িকা যথেষ্ট সচেতন। এখানেই বৈষ্ণব কবিদের নায়িকা রাধার মতই মহারাজা বীরচন্দ্রের দৃষ্টিতে নায়িকাও অব্যক্ত প্রেমের প্রগাঢ় ভাবতন্ময়তা প্রকাশ করেছে মিনতি আকারেঃ "ধর মোরে, এসো কাছে, ক্ষণমাত্র আর,/এই দেহে রহিবে জীবন।"[৬২] কিংবা, "মন দিব, প্রাণ দিব, সাধের যৌবন,/ ও চরনতলে বিকাইব।"[৬৩] পক্ষান্তরে, নায়কের মনও নায়িকার ভাবতরঙ্গের প্রতি সচেতন। সংশয়-দ্বন্দ্বে, নায়িকার অব্যক্ত প্রেম এর বিচিত্রতা ধরা দিয়েছে নায়কের ভাবনাকে ঘিরে। নায়কের ভাবনায় যৌবনের প্রেম গাঢ়তর হলেও এবং কিশোর বয়সের প্রেমে ক্ষণস্থায়ী উচ্ছ্বাস-আবেগের মাত্রাধিক্যতা থাকলেও— "সে রূপের স্মৃতি লয়ে চিরদিন হবে গত,/বুঝেছিনু নিরাশ-প্রণয়।"[৬৪] তাই কিশোরী নায়িকা নায়কের দৃষ্টিতে আজও অমলিন ।স্নেহ-ভালোলাগার বন্ধন আজ পরিণত হয়েছে মিলনোন্মুখ ভালোবাসায়; অর্থাৎ যে স্নেহের মুকুল উদ্ভাসিত হয়েছিল, আজ তা পূর্ণ পরিণত চেতনার আবেশে। যথার্থ এ উত্তোরণ। একজন মহারাজার দৃষ্টি কোণে এই ভাবনা-চেতনায় সম্পূর্ণ কাব্যটি সমাপ্ত করা নিঃসন্দেহেই প্রশংসাবাচক। তাই কাব্য পরিণতিতে নায়ক, নায়িকাকে

আহ্বান জানিয়েছে; পূর্ণ মিলনে, শাশ্বত প্রেমের আবর্তনে নায়ক নায়িকার সুখ স্বপ্ন তাই সার্থক হয়েছে— "স্বপন কি জাগরণ-বুঝিতে পারিনা,/এই মরমের তলে,/কি সুধা ঢালিয়া দিলে,/মুদিয়া আসিছে আঁখি নিমেষে নিমেষে,/যেন কত ঘুমের আবেশে ।"[৬৫]

কবিচেতনায় মিলন প্রেমের পরিণত রূপ নয়; মিলনের আনন্দ উচ্ছ্বাসেও বিচ্ছেদের রাগিনী বাজে। মিলনের তৃপ্তির মধ্যেও বিচ্ছেদের আশংকাজনিত চেতনা সদা জাগ্রত থাকে। তাই কৈশোর প্রেম মুকুলিত হয়ে যৌবনের পূর্ণ প্রেমধারায় বিকশিত হলেও বিচ্ছেদের বিরহ সম্পর্কে কবিসত্তা সর্বদাই সচেতন। তাই শুধুমাত্র মিলন দিয়েই কাব্যসমাপ্ত হয়নি । দ্বিধা- দ্বন্দ্বময় ব্যক্তি অনুভূতি এবং সেই সঙ্গে বিরহ চেতনাবোধও ধরা পড়েছে কাব্য মধ্যে— "আগে যদি জানিতাম প্রণয় এমন,/আছে তায় শত বাধা সুখের মিলনে,/ হৃদয়ে বিরহ পশি,/পোড়াইবে দিবা নিশি,/ চাহিতাম তবে কি রে তোমারে কখন,/ যদি সদা দহিবে জীবন ।"[৬৬]

জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতাবোধ কবিমনকে সম্পৃক্ত করেছে, যার ফসল 'অকাল কুসুম' কাব্যটি। ব্যক্তিমনের অনুভূতি-উপলব্ধিবোধ যেন নায়ক-নায়িকার রূপকার্থে অখন্ড চেতনা নিয়ে ধরা দিয়েছে। গীতিকবিতার মূর্ছনায়, আবেগ-উচ্ছ্বাস যথেষ্ট সংযত হয়েছে। প্রতিটি স্তবকের ভাবনা, পরবর্তী স্তবকে প্রবাহিত থেকে সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছে এ কাব্য। পরবর্তী 'সোহাগ' কাব্যটির ভাবনার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যতাবোধ রয়েছে 'অকাল কুসুম' কাব্যটির। এ কাব্যের সূচনাতেও চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের বিখ্যাত পদ সংযোজিত হয়েছে— "রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল ।/যৌবন বনের মাঝে মন হারাইল।" [৬৭] ব্যঞ্জনায়, ভাবকল্পনায় কবিমন সম্পূর্ণ প্রসারিত এ কাব্যে। ২২-টি দীর্ঘ কবিতার গ্রন্থনে ভাব ও ভাবনা দোলায়িত। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য কাব্যটি তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী মনোমোহিনী দেবীকে উপলক্ষ করে, উপহার স্বরূপ উৎসর্গ করেছেন। কাব্যটির ক্ষেত্রেও কবিমনের প্রশান্তি ও ভালোবাসার পরমতৃপ্তি অনুরণিত।

'সোহাগ', 'ভালোবাসা'-র নামান্তর; জীবনসুধা স্বরূপ। কবি সযত্নে লালন করেছেন অন্তরে দীর্ঘদিন। কবি হৃদয়ের উদ্ভাসিত প্রেমচেতনায় শাশ্বত-পরিপূর্ণ রূপটি গড়ে উঠেছে এই কাব্যটিকে কেন্দ্র করে । কবি অনুভব-বিশ্বাস করেন পূর্ণাঙ্গ যৌবনের বিকাশ একমাত্র প্রকৃত প্রেমের ফলেই সম্ভব । তাইতো বসন্তের জাগরণে বনভূমি যেমন পূর্ণরূপ লাভ করে, তেমনই কবিভাবনায়— "প্রেমরাজ্যে বসন্তের নাহি মাস ভেদ,/শুভ্র কেশ হেরি অরসিক মনে খেদ,/অন্তর যৌবন যার সেই যুবজন,/চপলা চমক যেন বাহির যৌবন।"[৬৮] কবি এ কাব্যেও প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে সুখ-মিলন স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। লাস্যময়ী, নারীর হৃদয়জয়ী ভালোবাসায় কবিপূর্ণ; তার সাথে কবির প্রাণের টান। এই অদম্য প্রাণের মিলনেই বারংবার ফিরে আসে পুরাতন প্রেম- স্মৃতি— "তোমার সহিত প্রিয়ে প্রাণের মিলনে,/সমান বয়সী মেলি,/করিতে সলিল কেলি,/তড়িত জড়িত হাসি ভাসিত বদনে,/ হেরিতাম তৃষিত নয়নে।"[৬৯] কবি এ কাব্যে যেমন প্রেমের যন্ত্রণাকেই মহৎ এবং সারাৎসার বলে মনে করেছেন, তেমনই কাব্যের অন্তর্গত 'মদনোৎসব' কবিতায় একথাও স্বীকার করেছেন যে, ভ্রমর যেমন কাঁটার আঘাত সহ্য করেও মধুপান থেকে বিরত থাকে না, প্রেমও সেরূপই যাতনাদায়ী। অলংকার স্বরূপ যন্ত্রণাই প্রেমকে এক স্বর্গীয় অনুভূতি প্রদান করে। কবি এ কাব্যে প্রকৃতিকেও বর্ণনা করেছেন গীতিকবিদের অনুসারী হয়ে।

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কবিসত্তার বেশীরভাগ অংশ জুড়েই প্রেরণাদাত্রীরূপে ছিলেন তাঁর প্রথমা মহীষী ভানুমতী দেবী। নবীন যৌবনের সাথী, প্রগাঢ় ভালোবাসার অঙ্গীকার। তাই স্বাভাবিকভাবেই কবিসত্তায় প্রথমা পত্নীর বিচ্ছেদ, বিরহ যন্ত্রণা কবিমননকে দগ্ধ করেছিল। দ্বিতীয়া পত্নী মনোমোহিনী দেবীর ভালোবাসা, নিবিড় প্রেমে কবিহৃদয়ের দহন কিছুটা প্রশমিত হলেও, পূর্ণাঙ্গ মুক্তি পায় নি। তাই প্রতিটি কাব্যেই ঘুরেফিরে না পাওয়ার বেদনা-যন্ত্রণা; স্মৃতি রোমন্থিত হয়ে ওঠে। কাব্য-কবিতায় এ ভাব সম্পৃক্ত— "যার প্রেমে একবার ভুলিয়াছে মন,/তারে কি ভুলিতে আর পারি কোনদিন?/সেই মন তার লাগি,/হয় চির অনুরাগী,/তারে ভালবাসে

অনুদিন/নাহি পেলে সেইজনে, বিরহ দহন,/অন্তরে বাহিরে তার পেড়ে অনুক্ষণ।"[৭০] আক্ষেপানুরাগ, রাগ, ভাবোল্লাস কবিতাগুলিতে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অনুভূতি ও জীবনোপলব্ধি কবিতার বিষয়ানুসারী হয়েছে; পক্ষান্তরে, দ্বন্দ্ব-অতৃপ্তি ও বেদনার তীব্র সুর ধ্বনিত হয়েছে। রাধার মতই এ সকল কবিতার নায়িকারা মনে করেছে যে, মিলনেও বিচ্ছেদের সুর বাজে।

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের 'সোহাগ' কাব্যটিতে প্রেমের বহুধা বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্মৃতি রোমন্থনের মধ্যে দিয়ে বিগত প্রেমের বিরহ-যন্ত্রণাবোধ এবং বর্তমান জীবনের অফুরন্ত ভালোবাসার উল্লাসকেই তিনি একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছেন। তাই কবিতার নামগুলোও হয়েছে একাধিক বিষয় ভাবনা কেন্দ্রিক। যেমন- যৌবনবসন্ত, মদনোৎসব, বসন্তপঞ্চমী, যুগলবসন্ত, বসন্ত-পূর্ণিমা, আছে কিরে মনে, আকিঞ্চন, দেখি আরবার, গত একদিন, কলংকী সেই মুখখানি, নববালা, গতকথা, ফুল-দোল, স্মৃতি, পত্র, আক্ষেপানুরাগ-রাগ, উপহার, ভাবোল্লাস, ইত্যাদি। এই কাব্যে কবিসত্তা অনেক বেশী শান্ত-সংযত- সমাহিত আপন চেতনায়। অযথা আবেগ রূদ্ধ করে, প্রশান্তির-বিশ্বাসের সত্য-মঙ্গলময়তা ছড়িয়ে পড়েছে এ কাব্যে। শেষ কাব্যরূপে, কবিমননের ধীশক্তি প্রগাঢ় হয়েছে। অনুভূতিবোধ ও উপলব্ধির জগতে এসেছে ভিন্ন মাত্রা। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের 'সোহাগ' কাব্যটি তাই চরম শিল্পোৎকর্ষতা লাভ করেছে।

পার্বত্য রাজ্য সুন্দরী ত্রিপুরায় দীর্ঘদিন ছিল রাজতন্ত্র। রাজআনুকূল্যে কবি সাহিত্যিকগণ কাব্য সাহিত্যচর্চা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। পূর্বভারতের এই ক্ষুদ্ররাজ্যটি নিজস্ব ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্রমন্ডিত ছিল। বংশপরমপরায় রাজতন্ত্রের নিয়মানুসারেই রাজপদে একাধিক রাজা সুযোগ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক রাজাই ছিলেন সুদক্ষ শাসক, পরিচালক, ধীশক্তি সম্পন্ন ও প্রত্যয়বান। দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। পাশাপাশি অনেক রাজাই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন রাজআমল থেকেই ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার প্রায় তিনদিক ঘিরেই অবস্থান করছে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, তাই সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাব ত্রিপুরারাজ্যে, প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেই পড়েছে । নিবিড় সম্পর্কের দরুণ রাজআমল থেকেই যোগসূত্র আজও বর্তমান। যখন রাজার রাজসভাকে কেন্দ্র করে চলে সাহিত্যচর্চা, তখনই দরবারী সাহিত্যের জন্ম হয়, স্রষ্টা এক্ষেত্রে রাজাও হতে পারেন। তবে রাজ আনুকূলে বিশেষ সাহিত্যচর্চার বিকাশ-বিস্তার ও পরিণতি দেখা যায়। দরবারী সাহিত্যে তাই সাধারণত রাজার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকে, রাজআনুকূলে, রাজকীয় বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ সাহিত্যে রাজপ্রশস্তির উচ্চবাক্য ধ্বনিত হয়। কখনও বা রাজাও স্বয়ং স্রষ্টার ভূমিকায় থাকেন। স্রষ্টার মানসিকতায়, অভিজ্ঞতায় সর্বোপরি রাজকীয় চিন্তা-চেতনায়-ভাবনায় কাব্যসম্পদ গড়ে ওঠে। আবেগ-উচ্ছ্বাসময় পরিবেশনা ও রাজকীয় শ্রুতিমাধুর্যতায় পরিবেশিত হয় দরবারী সাহিত্য।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজভাষা ছিল বাংলা। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ এর বাংলাভাষার প্রভাব তাই দরবারী সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ বাংলাভাষাতেই দরবারী সাহিত্য সম্পদ সৃষ্টি হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ প্রাক্ আধুনিক যুগে দরবারী সাহিত্য ধারায় 'রাজমালা', 'কৃষ্ণমালা', 'শ্রেণীমালা', 'চম্পক বিজয়', 'গাজীনামা', ইত্যাদি কাব্যসাহিত্য রচিত হয়। প্রায় প্রত্যেক রাজআমলেই দরবারে সাহিত্যচর্চা চলে। এই ধারায় সংযোজিত হয় রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যসম্পদ; আধুনিক যুগের সূচনাই ধরা হয় উক্ত রাজআমল থেকে। অতঃপর সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে স্রষ্টারূপে রাজার স্বয়ং আত্মপ্রকাশ দরবারী সাহিত্যকে অন্যমাত্রা দিল। এই দরবারী সাহিত্যের উত্তরাধিকার বহন করে চললেন পরবর্তী রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনী দেবী, শ্রীমতি কুমুদিনী বসু, শ্রীমতি গিরীন্দ্রবালা দেবী, মৃণালিনী দেবী, রাজকুমার নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর, কৃষ্ণজিৎ দেববর্মন প্রমুখ। ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের সহায়তায়,

উৎসাহে, উদ্দীপনার, স্বরচনায় যে দরবারী সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছিল, তা শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজসংস্কৃতির প্রতীক নয়, চিরকালের সম্পদ ও দলিলরূপে বিবেচিত। এই সকল দরবারী সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হয়েছে কখনও কোন অনৈতিহাসিক কাহিনী-সিদ্ধান্ত, লোক উপাদানরূপে জনশ্রুতিকে কেন্দ্র করে; কখনও কবির কল্পনা, চিন্তা, আবেগ নির্ভর ঘটনাকেও কেন্দ্রে রেখে-ফলে প্রত্যেকটি সাহিত্যেই তৎকালীন জনজীবন, বঙ্গীয় সংস্কৃতি, মহত্তর জীবনাদর্শ, বিচিত্র অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ফুটে উঠেছিল।

ত্রিপুরা রাজতন্ত্রের রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ললিতকলা, শিল্পসাহিত্য চচার প্রতি, ফলে দৈনন্দিন বিচিত্র ঘটনাবলী, তাঁর মানসিকতা, আবেগ, অনুভূতি সাহিত্যের অন্তরে ধরা দিয়েছিল, উপযুক্ত দরবারী মন-মেজাজেই তিনি কাব্যসাধনা করেছেন, বাংলা ভাষায় সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের কাব্যসাধনার কেন্দ্রস্থলে ছিল রাজআমলের এই সকল দরবারী সাহিত্য। অখন্ড বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে যখন রাজকেন্দ্রিক দরবারী সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতা দেখা গিয়েছিল, বাংলাদেশেও আরাকান রোসাং রাজসভাকে কেন্দ্র করে দরবারীসাহিত্য চর্চা চলছিল; তখন পূর্বের ক্ষুদ্র পার্বত্যরাণী ত্রিপুরাতেও এই ধরনের কাব্যচর্চা থেমে থাকে নি। তাই ত্রিপুরার রাজসভাকেন্দ্রিক কাব্যগুলি সংস্কৃতিচর্চার আধার ছিল। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় জীবনের চিন্তা-ভাবনা, চেতনা-অনুভূতি ইত্যাদি উদ্ধারিত হয় দরবারীসাহিত্য বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে, স্রষ্টা যখন মহারাজা হন, তখন দরবারীসাহিত্যে জাতীয় জীবনাদর্শের পাশাপাশি রাজমানসিকতা, রাজসত্তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রত্যেকটি কাব্যই তাই নিঃসন্দেহে দরবারী সাহিত্যের গুণ-মর্যাদাসম্পন্ন।

কবির বৈষ্ণবীয় ভাবনায় গড়ে উঠেছে প্রথম দুটি কাব্য 'হোরি' ও ঝুলন-প্রত্যেকটি পদেই পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার আকৃতি ঝরে পড়েছে। কখনও বা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সৌন্দর্য সাধনা চলেছে। দরবারী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য সাধনা। গভীর প্রেমানুভূতি থেকে রাধা-কৃষ্ণের সার্বিক ঈশ্বরীরূপ সৌন্দর্যের আলোকে প্রকাশ করেছেন কবি। 'ঝুলন' কাব্যটিকে যুগলমূর্তির কুঞ্জবনে দোদুল্যমান সৌন্দর্য যেন পার্থিবলোক থেকে অপার্থিব জগতে উত্তরণ করেছে। শ্রীকৃষ্ণের নবঘন দৈহিক সৌন্দর্য এবং রাধিকার যৌবনের রূপৈশ্বর্য সত্যিই বৈষ্ণব কবিদের সমতুল্য । কবি রাজদরবারে রাজশাসন- পরিচালনে দক্ষ থাকলেও মন ও মানসিকতায় ছিলেন রূপস্রষ্টা। তাইতো শৃঙ্গার রসে লালিত তাঁর প্রতিটি পদই রাজসভায় দ্যুতি সৃষ্টি করে। গৌরাঙ্গের রাধাভাব দ্যোতনার পদগুলিতেও যে মাধুর্যতা, শব্দঝঙ্কারে অনুরণিত হয়েছে-তা নিঃসন্দেহেই দরবারী মেজাজের আনুকূল্য। রাজসভায় প্রতিবছর ধর্ম-জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে যে দোল ও ঝুলনযাত্রা পালিত হতো সাড়ম্বরে, কবির কাব্যদুটি এই অভিজ্ঞতারই ফসল। তাই বাস্তবিক জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে সৌন্দর্যের দীপশিখা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কাব্যদুটিকে উপযুক্ত রাজসভার কাব্য করে তুলেছে। কাব্যগুলির অপর বৈশিষ্ট্য এর গীতিমাধুর্যতা দরবারী সাহিত্যের অন্যতম অপর বৈশিষ্ট্য এই গীতিমুর্ছনা, সুরঝঙ্কার, সুর-তাল-ছন্দ লয়ের উপযুক্ত প্রয়োগ; যা প্রায় প্রত্যেকটি দরবারী সাহিত্যের সম্পদ।

উক্ত মানদন্ডের আলোকে বিচার করলে বলা যায় যে, মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক, উপযুক্ত শ্রোতা, সঙ্গীত প্রিয় গুরু। রাজদরবারে ঝুলন, হোরি উৎসবগুলিকে উপলক্ষ্য করে কবি পদ বাঁধতেন-যেগুলি সঙ্গীত আকারে, সুর-তাল-লয়ের সমন্বয়ে ধ্বনিত হত। এই সকল বেশ কিছু রাজসভায় গীত সঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে কাব্যদুটির অন্তরালে, রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রণয়লীলাকে পর্যায়রূপে 'অভিসার', 'মিলন', 'রাসলীলা'-র গীতের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ করতেন কবি। এভাবেই গ্রন্থেও (হোরি কাব্য) সঙ্কলিত হয়েছে; "দরবারী কানাড়া, কাফী, ভৈরবী, তিলককামোদ, মালকোষ, বাগেশ্রী, বৃন্দাবনী সারঙ্গ প্রভৃতি রাগসমূহের বিশেষ অনুশীলন করে"(৭১) যখন একাধিক সঙ্গীতজ্ঞের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হত, তখন কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের হৃদয়ে-মনে দীর্ঘক্ষণ এই আমেজ ধরা থাকতো, যার ফসল

উক্ত কাব্যসমূহ। দরবারী সুর-তালেই 'ঝুলন', 'হোরি' কাব্যের পদগুলির মাধুর্যতা অনুভব করা যায়।

দরবারী সাহিত্যের ভাব-ভাবনা ও আবেগকে তুলে ধরেছিলেন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তাই তো প্রিয়তমা প্রথমা পত্নীর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন একাধিকবার 'প্রেম মরীচিকা' ও 'উচ্ছ্বাস' কাব্যদ্বয়ে। এছাড়া দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি গভীর-প্রগাঢ় ভালোবাসার আবেগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'অকাল কুসুম' এবং 'সোহাগ' কাব্যদুটি। প্রত্যেকটি কাব্যেই ('হোরি', 'ঝুলন', 'প্রেম মরীচিকা', 'উচ্ছ্বাস', 'অকালকুসুম', 'সোহাগ') ধরা পড়েছে প্রকৃতির সুনিবিড় সান্নিধ্য। কাব্যের অভ্যন্তরে চিত্রকল্প ও প্রকৃতির চিত্রপট মিশেমিশে কবি মনের ধারক সৃষ্টি করেছে; এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শব্দেশ্বর্য ও শব্দঝঙ্কার। মধুর প্রেক্ষাপটে, ভাবনার চিরন্তন ঔদার্যে কবি হৃদয়কে সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছেন কাব্যগুলিতে। তাই দরবারী সাহিত্যের ধারায় কাব্যগুলি অনন্য হয়েছে। ভাব ব্যঞ্জনার সৌন্দর্যও ধরা পড়েছে একাধিক চিত্রকল্পকে কেন্দ্র করে। দৃষ্টান্ত— "বরষার কি কুহক রাজি/নানাকারে মেঘতনু নানারঙ্গে রামধনু,/মম স্মৃতি মায়া দরপন,/আনিয়ে আবার,/ দেখাই কতই ছবি তাহে বার বার।"[৭২] কিংবা— "সঘনে দাদুরী করত কলরব/ময়ূর নাচত রঙ্গমে,/করহি সন্স বহত সমীরণ/বরিখে ঝরঝর তরল জলধর/গরজে গম্ভীর মাদিয়া/মন্দ মনসিজ মনহি দহদহ/দহই বিরহীক ছাড়িয়া ।"[৭৩]

একদিকে চিত্রকল্পের উপযুক্ত প্রয়োগ, অপরদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মহারা কবিপ্রাণ বিভোর রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি উপাসনায়-কাব্যপ্রাণে জেগে ওঠে তাই বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের উৎস্রোত। সক্রিয় এ বর্ণনায় কাব্যগুলি ('হোরি', 'ঝুলন') নিঃসন্দেহেই দরবারী কাব্য হয়ে উঠেছে। প্রেমকে শাশ্বত রূপ দান করে, ব্যক্তি প্রেমের অনুভূতি বিশ্বজনীন করে তুলে কবি বীরচন্দ্র মাণিক্য আপন হৃদয়ভাবনা, প্রেমিকসত্তাকে যেন চিরন্তন করে তুলেছেন। পত্নীর জন্য বিরহ-যন্ত্রণা একদা কাবর হৃদয়কে গ্রাস করেছিল, তা থেকে এবার মুক্তি পেল হৃদয়। যন্ত্রণা যেন চিরশান্তির সৌন্দর্যে তীব্রতর হয়ে উঠল। প্রেমের শাশ্বত রূপাঙ্কনে কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যগুলি উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে ধরা দেয়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের প্রেমানুভূতিতে তাই সহজেই কবিসত্তা-কবিচেতনা ধরা পড়ে। দরবারী সাহিত্যে রাজকবির অন্তর্মননে বিধৃত অনুভূতি-উপলব্ধি জাগ্রত থাকে-এদিক দিয়ে বিচার করলে কাব্যগুলি দরবারী মেজাজে সম্পৃক্ত। এছাড়াও রয়েছে ভাব-ভাষা, অলংকার ও উপস্থাপনার চারুত্ব। প্রত্যেকটি বিষয়েই পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক উপস্থাপনা ঘটেছে কাব্যশৈলীতে, যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা যোগ্য।

কাব্যের ভাব, ভাষাভঙ্গী, শবৈশ্বর্য, আলংকারিক সৌন্দর্য কাব্যে চারুত্বতা দান করে। কবি আপন হৃদয়ের অনুভূতি, অব্যক্ত উপলব্ধি ভাষার মধ্যে দিয়েই কাব্যে প্রকাশ করেন। কারণ, ভাষা হল আত্মা, দেহ-মনের অভীপ্সাকে-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলার মাধ্যম। অপরাপর হৃদয়ের সঙ্গে ভাব বিনিময় ও সেতুবন্ধন করে ভাষা। কোন কবির কাব্যে ভাষা, ভাবও ভাবনার আধার হয়। কাব্য যখন দরবারী সাহিত্যের মর্যাদা পায়, তখন সেখানে তো ভাব প্রকাশের অঙ্গরূপে ব্যবহারিক কাব্য-ভাষার চারুত্ব অনুসন্ধান জরুরী হয়ে পড়ে। রাজা যখন কবি হন, তখন সেই কাব্যের ভাষায় থাকে শব্দবৈভব, রত্নউপস্থাপনা, বাক্ শৈলীর চাতুর্যতা- যা কাব্যকে দরবারী সাহিত্যে উন্নীত করে । শ্রুতিমাধুর্যতার ঝঙ্কারে এবং আলংকারিক সুষমায় কাব্যভাষা হয়ে ওঠে অনন্য। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রচিত ছয়টি কাব্যগ্রন্থেই ভাষার উপস্থাপনা রাজকীয়। সমগ্র কাব্যগুলির পাঠ বিশ্লেষণে ভাষারীতির কিছু বৈশিষ্ট্য উঠে আসে। যেমন—

ক। কাব্যের অন্তর্গত বেশ কিছু পদের সহজ-সরল-সাবলীল ভাষাপ্রয়োগ নজর কাড়ে। ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল বাংলা। অবশ্য পার্শ্ববর্তী বাঙলাদেশের ভাষার প্রভাব এই স্বচ্ছন্দ্য পদ্যরীতিতে দেখা যায়। প্রচলিত, প্রাত্যহিক ব্যবহারযোগ্য একাধিক শব্দের সমন্বয়ে এমনভাবে পদরচনা করা হয়েছে, যা প্রত্যেকের বোধগম্য। দুর্ভেয়-দুর্বোধ্য শব্দ পরিত্যাগ করে কাব্যভাষায় উঠে এসেছে অপিনিহিতি প্রাচুর্যতা। এছাড়া তৎসম, তদ্ভব,

অর্ধতৎসম, বিশেষত দেশী শব্দের ব্যবহারে ভাষা হয়েছে সহজবোধ্য-জীবন্ত।

দৃষ্টান্ত—

"যা বলিবে তাহাই করিব,
মন দিব, প্রাণ দিব, সাধের যৌবন,
ও চরনতলে বিকাইব ।" [৭৪]

কিংবা—

"গিয়াছে সেদিন প্রিয়ে; আর দহিবে না হিয়ে,
কল্পনা লইয়া
স্বপনে পাইয়া তোরে, যেমনি বাড়ানু প্রেম,
এসো আজ দুজনে মিলিয়া,
সাধের যৌবন ফুল বনে,
বিহার করিব,"[৭৫]

খ। ছন্দের প্রয়োজনে কাব্যিক রূপ (কোন গদ্য শব্দের) যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করে ছান্দিক মাধুর্যতাও দান করেছেন কবি। প্রয়োজনে একই সাথে তৎসম শব্দের কাঠিন্যতার সঙ্গে কাব্যশব্দ রূপের মেলবন্ধনে আবেগ ধ্বনিত হয়েছে। বিপ্রকর্ষ, অভিশ্রুতি, নাসিক্যভবন, স্বরসঙ্গতির যথাযথ ব্যবহারেও কবিমনের ভাব প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ যে বিষয়ভাবনাকে কেন্দ্র করে কাব্য গড়ে উঠেছে, তার প্রতি কবি সতীক্ষণ নজর দিয়েছেন। কবিমনের অনুভূতি তাই সর্বদা রাজকীয় গাম্ভীর্যে ও দরবারী ধ্রুপদীয়ানায় বাঁধা পড়ে নি, প্রয়োজনে ভাবনানুযায়ী অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। দৃষ্টান্ত—

"দেখিতাম যে মুরতি তব,
সে সুখ স্বপনে,
আজিও খেলিছে মোর মনের নয়নে।"[৭৬]

কিংবা—

"সুখে দুখ গিয়াছে ডুবিয়া,
দঃখের হৃদয়ে আজি, নেশার আধেক ঘোরে
রহিয়াছে কি সুখ ছাইয়া,
নয়নে ভাসিছে গত সুখের স্বপন,
পাইয়া তোমার সেই সুখ সম্মিলন।"[৭৭]

কিংবা—

"সেই বিদায়ের সেই সজল নয়ন,
উছলিত হৃদিসিন্ধু,
অনন্ত মুকুতাবিন্দু,
প্রতি হৃদে গ্রন্থি-সূত্রে করেছি গ্রন্থন ।"[৭৮]

গ। কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের অন্তরাত্মায় রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তির সৌন্দর্য আরাধনা ও বন্দনাই ছিল প্রধান । কারণ, পরমাত্মার প্রতীক রূপে ঈশ্বর-ঈশ্বরী, কৃষ্ণ-রাধিকাকে আরাধনা করতেন তিনি। তাই 'ঝুলন', 'হোরি' কাব্যদ্বয়ের একাধিক স্থানে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-ভাষাভঙ্গি, রীতির প্রভাব পড়েছে। ছান্দিক মাধুর্যতাও ছিল পদাবলী অনুসারী। আত্যন্তিক নিষ্ঠায়, কখনও বা সংস্কৃত, ব্রজবুলীর শব্দভাষার-ভাবের অনুসঙ্গে তিনি পদ

সাজিয়েছেন। দৃষ্টান্ত—

"রসে ডগমগ ধনী আধ আধ হেরি,
আঁচল সঁঞে ফাগু লেই কুঁয়রী ।
হাসি হাসি রসবতী মদন তরঙ্গে,
দেয়ল আবির রসময় অঙ্গে।
সুচতুর নাহ হৃদয়ে ধরু প্যারী,
মুচকি মুচকি হাসি হেরত গোরী।"[৭৯]

কিংবা—

"লোলাপাঙ্গ সকাম হাস ললিতা নৃত্যন্তি গোপাঙ্গনাঃ ।
মধ্যাকম্পতয়া স্থলৎকারিকা বেনী শথং কম্পতে।।
কাঞ্চী স্থুলনিতম্বয়োশচুচুকয়োহরিশ্চ সন্দোলতি।
পাদক্ষেপণ লীলয়ারণ রণং শব্দায়তে নুপূরম॥"[৮০]

কিংবা—

"দেখরে, যৈছে শ্যাম ঐছে প্রিয় সোহাগিনীরে, দেখ দেখরে
মৃদুহাস্য সুধাময় চন্দ্র মুখং।
মধুরাধর সুন্দর পদ্মমুখীং।
কি দিয়া তুলিব দোঁহে, তুলনা নাই জগতে, দেখ দেখরে ।"[৮১]

এক্ষেত্রে, "বাংলা, সংস্কৃত ও মৈথিলী অপভ্রংশ ভাষা বা ব্রজবুলি ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রয়াস লক্ষণীয়।"[৮২] কবির অন্তর্নিহিত আত্মাহারা মনোভাবের স্ফূরণ ঘটেছে কাব্যগুলিতে। তাই শুধুমাত্র বাংলাভাষাকে অবলম্বন করেই রাজকীয় ভাবপ্রকাশ করেন নি, তা একাধিক শব্দৈশ্বর্যের সংযোগে বিকশিত করেছেন।

ঘ। কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের সবকটি কাব্যেই অলংকারের সংযোজনা সুন্দর, শ্রুতিমধুর। রাজদরবারের উপযুক্ত ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন কবি। তাই প্রায় প্রতি কাব্যের প্রতি পদেই এসেছে শব্দালঙ্কার ও আবেগ ও অর্থালঙ্কার। বিষয়ভাবনাকে ভাবের আঙ্গিকে প্রকাশ করতে অনুভূতি নির্ভর করে গড়ে তুলতে কাব অলংকারের সাহায্য নিয়েছেন। রাজসভার কাব্য বলেই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়েছে শব্দঝঙ্কার। এরকম বেশ কিছু অলংকারের উদাহরণ কবির কাব্যসম্পদ থেকে তুলে ধরা হল—

বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার:
১) "মুকুট পরি খচিত শিখী পুচ্ছে নবমল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে॥"[৮৩]
২) "গজ গঞ্জন-গামিনী ধনী রমনীর শিরোমনি।"[৮৪]
৩) "কথায় কথায় হাসি, বালিকা যখন ছিলে,
শাদা শাদা শিশুর হৃদয়"[৮৫]
৪) "চরন চালনে দোলিছে দোলনে ।"[৮৬]

যমক অলংকার :
১) "বিনোদ হিল্লোলে বিনোদনাগর
বিনোদিনী সহ ঝোলে,
চারিদিকে মিলি বিনোদিনী দল,
নাচয়ে বিনোদ তালে।"[৮৭]

অন্ত্যনুপ্রাস :
"আজু অপরূপ বৃন্দা বিপিনকি মাঝে,

বিহরই ঋতুরাজ মনোহর সাজে।
নবীন পল্লবে কিবা সুশোভিত ডাল,
কত সারী, শুক, পিকগাওয়ে রসাল।"[৮৮]

উপমা : ১) "কর্ণে কুন্ডল মনি ঝলমল
যেমন সৌদামিনী ঝলকে ঘন।"[৮৯]

২) "চারিদিকে সহচরী চলে রাই ঘেরি,
তারাগণ যায় যেন সুধাকর বেড়ি।"[৯০]

৩) "চন্দ্র বদনী ধনী, কানু চকোর,
নব বারিদে জনু, চাতক ভোর।"[৯১]

৪) "ঐ দেখরে নাগর ঝুলিছে ডালে
চূড়াটি বামেতে হেলে,
নবমেঘে যৈছে ইন্দ্রধনুকের শোভারে।"[৯২]

রূপক অলংকার : ১) "তেমনি আমার হৃদয়-আকাশ,
শীতল বিভায় করি পরকাশ,
দেখা দিল আসি সুখের ঊষা।"[৯৩]

২) "জাগ্রতে নিদ্রায় প্রিয়ে হৃদয়-মন্দিরে
ও দেব মূরতিখানি বিরাজে সতত।"[৯৪]

বিরোধাভাস অলংকার : "চাহিনা মুকতি আমি-চাহি এই ধামে,
অনন্ত নিবাস,
মন যারে চাহে সদা, তারি সহ মনে মনে,
মিশিতে অসীমে অভিলাষ।"[৯৫]

সমাসোক্তি অলংকার : ১) "বরিখ চাঁদিনী আধ মলিনিমা
রসবিহারের নিশি আজিরে,
হইয়া কৌতুকী ঠমকি মুচকি
হাসিতেছে যেন বনরাজিরে।।
মেঘ সুরসিয়। ইষৎ বর্ষিয়া
প্রেম বিন্দু বিন্দু যেন ঝরিছে।"[৯৬]

২) "শোভিল অটবি—শোভিল মাধবী,
কুসুম ভূষন পরা,
উঠিল মালতী ছাড়িয়ে শয়ন,
কুয়াশার জলে পাখালি নয়ন,
অলি যেন তায় কাজল ভরা।"[৯৭]

মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য সুদক্ষ শাসক, সমাজসংস্কারক হওয়া সত্ত্বেও কবিমনের উচ্ছ্বাস-আবেগ-ব্যক্তিগতঅনুভূতি-উপলব্ধিবোধ, প্রকাশক্ষমতাকে সংবরণ করতে পারেনি যার ফলে প্রতিটি কাব্যই মৌলিক-স্বতন্ত্র এবং গবেষণাযোগ্য।

কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণা খুবই কম; এমনকি তাঁর একক কাব্য কেন্দ্রিক

গবেষণাও বর্তমানে বিরল। তবে ত্রিপুরা রাজপরিবারের কবি-কাব্যসাহিত্যকে নিয়ে যে সকল গবেষণা, আলোচনা, প্রবন্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেখানে কবি বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্য প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। একাধিক তথ্যে অন্যান্য কবি-কাব্যের সাথে প্রসঙ্গক্রমে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যসম্ভার সেক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে যেমন—

১) গবেষণামূলক গ্রন্থ:-

ক) 'ত্রিপুরা রাজআমলের বাংলা সাহিত্য'- ডঃ রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণা পত্র।

২) আলোচনামূলক গ্রন্থ :-

ক) 'বীরচন্দ্র ও নিষিদ্ধ ছবি'—পান্নালাল রায়, সৈকত প্রকাশনী আগরতলা, ২০০৭, ISBN 81 9039544-0

খ) 'রাজা ও কবি'—অরুণোদয় সাহা, ২০০১

৩) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে গবেষণাপত্র:-

a) 'Migration in the last Hundred Years of Manikya Rule in Tripura: Investigating the histori cal Facts'- Nilanjan De, A/P in History, Rabindra Sadan Girls College, Karimgange. Published by SPIRI (Society For Promoting International Research and Innovation) International journal of social Science Tomorrow Vol. 1. No.2. etc.

৪) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে Article :-

a) 'Migration and ethnic Violence in Tripura' Salim Ali, Faultlines: Volume 20, Jan 2011. etc.

সমঋদার রাজকীয় জ্ঞান-দূরদর্শীতার পাশাপাশি তাঁর চেতনায় যে মহৎ কবিধর্ম বর্তমান ছিল, তা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায়। ক্ষুদ্র পার্বত্যরাজ্য ত্রিপুরাকে সমাদরে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, মাণিক্যরাজ্যের সমৃদ্ধময় কাব্যসমূহ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। তৎকালীন রাজপরিবেশে যখন গোষ্ঠিচেতনায় রাজার মন সম্পৃক্ত থাকতো, তখন সার্থক গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়েছিল কবির নিষ্ঠায়-আন্তরিকতায়, তাই তার সমগ্রকাব্য সম্ভার শুধুমাত্র ত্রিপুরার সম্পদ নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অমূল্যরত্ন, যা নিঃসন্দেহেই গবেষণাযোগ্য এবং প্রতিটি কাব্যই সুরশৃঙ্গারে, ধ্রুপদীয়ানায়, অলংকার- ধ্বনির সুষমায় দরবারী আমেজে উচ্চাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ।

এই মৌলিক গবেষণামূলক কর্মটির মধ্যে দিয়ে বাংলা দরবারী সাহিত্য ধারায় যে সকল বিশেষত্ব সংযোজিত হল, তা সূত্রানুক্রমে বলা যায়—

১) ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিক রাজপরিবারের অন্যতম মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যসাধনা, চিন্তাশক্তি, দরবারী আমেজ সমগ্র উত্তরপূর্বের সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করলো। বঙ্গীয় সংস্কৃতির ধারায় নবতর সংযোজন ঘটল উত্তরপূর্বের সংস্কৃতি।

২) বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত রাজন্যবর্গের সাহিত্যচর্চাকে কেন্দ্র করে বহুল গবেষণার সমান্তরালে সুদূর ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চাও জনমানসে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করলো ।

৩) বাংলা আধুনিক গীতিকবিতার ধারায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যদ্বয় নিঃসন্দেহে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গলের সঙ্গে এবং অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' শোককাব্যের সঙ্গে তুলনীয়; ভবিষ্যতে এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণাও সম্ভব ।

৪) ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণেও বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যগুলি নবজ্ঞান ধারনার প্রতিষ্ঠা করে। পার্শ্ববর্তী

বাংলাদেশ এর উপভাষা বঙালী, বাক্ ব্যবহাররীতি, প্রচলিত শব্দ কাব্যগুলির শৈলীতে ধরা পড়েছে। এ বিষয়েও গবেষণা সম্ভব ভবিষ্যতে, এছাড়া দরবারী ধ্রুপদীয়ানায় সুরমুর্চ্ছনা ও আলংকারিক শ্রুতিমাধুর্যতা কাব্যগুলিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে— এ বিষয়েও এ কর্মটিতে আলোকপাত হয়েছে।

সর্বোপরি, সমগ্র বাংলার দরবারী সাহিত্যের সঙ্গে বীরচন্দ্র মাণিক্যের কাব্যভাবনা, চেতনাসত্তা সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবে আশা করা যায়। যে রাজসাহিত্য এতদিন আবৃত ছিল, তা বাংলা দরবারী সাহিত্যে সমমর্যাদায়-মূলে প্রতিষ্ঠিত হল এবং ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের এই কবি-মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনায় রইল আশা করা যায় ।

তথ্যসূত্র:

১) ভট্টাচার্য, ড. রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৪২।
২) তদেব।
৩) মাণিক্য, মহারাজা বীরচন্দ্র। হোরি কাব্য। ৩৪ নং গীতি।
৪) তদেব, ১৭ নং গীতিকবিতা।
৫) তদেব, ২১ নং গীতি।
৬) তদেব।
৭) তদেব, ১৪ নং গীতি।
৮) তদেব, ৪০ নং গীতি।
৯) তদেব।
১০) তদেব, ২৪ নং গীতি।
১১) তদেব, গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ।
১২) তদেব, ২ নং গীতি।
১৩) তদেব, সূচনাংশ।
১৪) তদেব, সূচনায় গৌরসাধনা বিষয়ক পদ দ্রষ্টাব্য।
১৫) ভট্টাচার্য, ড. রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪৬।
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৬।
১৭) তদেব।
১৮) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৭।
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৭।
২০) তদেব।
২১) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৮ ।
২২) তদেব।
২৩) তদেব।
২৪) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৯ ।
২৫) তদেব, পৃষ্ঠা ১৩৮।

২৬) সরকার, সৌমেন্দ্র নাথ, সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল। কবির একখানি পত্র। রত্নবলী। এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০২।
২৭) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। প্রেম মরীচিকা। উপহার কবিতা ।
২৮) সরকার, সৌমেন্দ্র নাথ সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল। কবির একখানি পত্র। রত্নবলী, এপ্রিল ২০০৪, 'উপহার'গীত ২০৩।
২৯) ভট্টাচার্য, ড. রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৫১।
৩০) তদেব ।
৩১) সরকার, সৌমেন্দ্র নাথ। সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল। কবির একখানি পত্র। রত্নবলী। এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২১০।
৩২) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। প্রেম মরীচিকা। ছায়া কবিতা।
৩৩) তদেব, 'নিরাশের আশা' কবিতা।
৩৪) সরকার, সৌমেন্দ্র নাথ সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল। কবির একখানি পত্র। রত্নবলী। এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২১৫।
৩৫) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। 'প্রভাতের উপহার' কবিতা।
৩৬) তদেব।
৩৭) তদেব।
৩৮) সরকার, সৌমেন্দ্র নাথ সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল। কবির একখানি পত্র। রত্নবলী। এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০৪।
৩৯) তদেব, পৃষ্ঠা ২১২।
৪০) তদেব, পৃষ্ঠা ২১৯।
৪১) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। 'প্রেম লোক' কবিতা।
৪২) সরকার সৌমেন্দ্র নাথ সারদামঙ্গলের কবি বিহারীলাল। কবির একখানি পত্র। রত্নবলী। এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা ২০৭।
৪৩) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। 'বিনোদন' কবিতা।
৪৪) তদেব।
৪৫) ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬২।
৪৬) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। 'ইহলোক-পরলোক' কবিতা।
৪৭) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, ২০৭।
৪৮) তদেব, 'ছায়া' কবিতা।
৪৯) 'এষা'-মৃত্যু কবিতা, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫-ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬।
৫০) ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৫৮।
৫১) 'এষা'- সান্তনা কবিতা, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৫-ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩।
৫২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। অষ্টমখন্ড। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০০৭, পৃষ্ঠা

৩৩৭ ।
৫৩) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। 'সে দিন ও এদিন' কবিতা।
৫৪) ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬৫।
৫৫) তদেব।
৫৬) ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬৬।
৫৭) তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৯।
৫৮) তদেব।
৫৯) তদেব।
৬০) তদেব,পৃষ্ঠা ১৭০।
৬১) তদেব পৃষ্ঠা ১৭১।
৬২) তদেব পৃষ্ঠা ১৭২।
৬৩) তদেব পৃষ্ঠা ১৭১।
৬৪) তদেব।
৬৫) তদেব পৃষ্ঠা ১৭৪।
৬৬) তদেব পৃষ্ঠা ১৭৫ ।
৬৭) তদেব, পৃষ্ঠা ১৮০।
৬৮) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বিরচিত 'সোহাগ' কাব্য। 'যৌবন বসন্ত' কবিতা।
৬৯) তদেব, 'আছে কিরে মনে' কবিতা।
৭০) তদেব, 'ভাবোল্লাস'।
৭১) ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৩৪৪।
৭২) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বিরচিত 'বর্ষা' কবিতা ।
৭৩) তদেব, 'ঝুলন' কাব্য, ৪১ নং গীতি ।
৭৪) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বিরচিত, 'অকালকুসুম' কাব্য।
৭৫) তদেব।
৭৬) তদেব।
৭৭) মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বিরচিত। 'উচ্ছ্বাস' কাব্য।
৭৮) তদেব, 'সোহাগ' কাব্য।
৭৯) তদেব, 'হোরি' কাব্য।
৮০) তদেব, 'ঝুলন' কাব্য, ৩৪ নং গীতি।
৮১) তদেব, ১৭ নং গীতি।
৮২) ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চন্দ্র। ত্রিপুরার রাজআমলের বাংলা সাহিত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি. এইচ, ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত গবেষণাপত্র। জুন, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৮৩) তদেব, ঝুলন কাব্য, পৃষ্ঠাঃ ১৪৫।

৮৪) তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৮।
৮৫) তদেব, অকালকুসুম, পৃষ্ঠা ১৭৩।
৮৬) তদেব, হোরি, পৃষ্ঠা ১৩৭।
৮৭) তদেব, ঝুলন, পৃষ্ঠা ১৪৮।
৮৮) তদেব, হোরি, পৃষ্ঠা ১৩৭।
৮৯) তদেব, হোরি, পৃষ্ঠা ১৩৯।
৯০) তদেব।
৯১) তদেব।
৯২) তদেব, ঝুলন, পৃষ্ঠা ১৪৫।
৯৩) তদেব, প্রেম মরীচিকা, পৃষ্ঠা ১৬১।
৯৪) তদেব, সোহাগ, পৃষ্ঠা ১৮৪।
৯৫) তদেব, প্রেম মরীচিকা,পৃষ্ঠা ১৫৫।
৯৬) তদেব, ঝুলন পৃষ্ঠা ১৪৬।
৯৭) তদেব, প্রেমমরীচিকা, পৃষ্ঠা ১৬০।

ঋণ স্বীকার:

১. মহাদেব চক্রবর্ত্তী, 'উত্তর-পূর্ব ভারত সেদিন ও আজ' (প্রথম খন্ড), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
২. ডঃ নলিনীরঞ্জন রায় চৌধুরী, 'মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস'-জ্ঞানবিচিত্রা, আগরতলা।
৩. মহারাজকুমার সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মা সম্পাদিত, হোলী, ২০০৩ সংস্করণ।
৪. ডঃ রঞ্জিত চন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ত্রিপুরার রাজ আমলের বাংলা সাহিত্য' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত গবেষণা পত্রের গ্রন্থরূপ।
৫. জহর আচার্জী 'পুরাতনী ত্রিপুরা' জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা।
৬. দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী 'মাণিক্য রাজার রিয়াং প্রজা' ত্রিপুরা দর্পণ।
৭. ড. জগদীশগণ চৌধুরী, 'আগরতলার ইতিবৃত্ত' ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড।